ত্রাণ বিতরণে অব্যবস্থাপনা

মানুষের দুর্ভোগ সরকার নির্বিকার

লিখেছেন **অনিরুদ্ধ ইসলাম**

সত্তরের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে যখন বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল বিধ্বস্ত, বানের পানিতে ভেসে যাওয়া লাশের গন্ধ সারা দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে, তারপরও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ঘুম ভাঙছিল না। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট তখন মার্কিন-চীন সম্পর্ক স্থাপনে কূটনীতির খেলায় ঢাকার ওপর দিয়ে উড়ে চীনে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে জলোচ্ছ্বাসে বিধ্বস্ত পূর্ববাংলার মানুষকে দেখে যাওয়ার জন্য ঢাকায় যাত্রাবিরতি পর্যন্ত করেননি। দুর্গত মানুষের ব্যাপারে পাকিস্তানি শাসকের ঐ আচরণ এ দেশবাসীকে চরমভাবে ক্ষুব্ধ করেছিল। মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী পল্টনে দাঁড়িয়ে হুংকার ছেড়েছিলেন, 'ওরা কেউ আসেনি।' জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যাওয়া মানুষের ব্যাপারে পাকিস্তানি শাসকের ঐ বিমাতাসুলভ আচরণ কেউ গ্রহণ করেনি।

তারপর চৌত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। বাংলাদেশ এখন স্বাধীন। বন্যা-ঝড়-জলোচ্ছ্বাস এ দেশের মানুষের নিত্যদিনের সঙ্গী। তারপরও তার বিরুদ্ধে লড়াই করে মানুষ বেঁচে আছে কেবল নয়, এ ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবেলার জন্য 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা'র একটি অবকাঠামো গড়ে তুলেছে যাতে এ ধরনের পরিস্থিতি সহসা মোকাবেলা করা যায়। বাংলাদেশের এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশ্বের প্রশংসাও পেয়েছে। যে কারণেই বন্যা-ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের মতো ঘটনা ঘটলেও তার ফলশ্রুতিতে মানবিক বিপর্যয় সেভাবে ঘটে না। এর সর্বশেষ উদাহরণ ১৯৯৮-এর ভয়াবহ বন্যা। প্রায় দু'মাস এ বন্যায় বহু মানুষ মারা যাবে বলে বলা হলেও ঐ পরিস্থিতি সামলে নেয়া গিয়েছিল। সরকার, এনজিও এবং বিশেষ করে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে অংশগ্রহণ সে সময়কার বানভাসি মানুষকে সাহস জুগিয়েছিল পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে।

কিন্তু এবারের বন্যায় প্রথম থেকেই জোট সরকার যে আচরণ করেছে তাতে বন্যার্ত মানুষের কেবল দুর্ভোগই বাড়েনি, তারা যে দুর্ভোগের মধ্যে আছে সরকারি এই স্বীকৃতিটুকু পেতে বেশ সময় লেগেছে। এখনও যখন সরকার বন্যার ভয়াবহতাকে স্বীকার করছে তারপরও ত্রাণ- উদ্ধারকাজ নিতান্তই অপ্রতুল। এ ধরনের পরিস্থিতিতে অতীতে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজের জন্য জরুরি ভিত্তিতে সেনাবাহিনী নিয়োগ করতে দেখা গেছে। এবার জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটি সরকারকে সেই সুপারিশ করলেও সেই লক্ষ্যে কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়নি। এনজিওগুলোও এবার হাত গুটিয়ে বসে আছে। তাদের সংগঠিত করে ত্রাণকাজে নামানোর ব্যাপারে সরকার একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু ত্রাণের ব্যাপারে সরকার আন্তর্জাতিক সাহায্য পাবে না বলে ঘোষণা দেয়ার কারণে দাতাসংস্থাগুলো এ ব্যাপারে কোনো তহবিল ছাড় না করাতে এনজিওরা অপেক্ষা করছে পানি নেমে যাওয়ার পর পুনর্বাসনের কাজে হাত দেয়ার পর। অন্যদিকে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বানভাসি মানুষের পাশে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এলেও সরকারের তরফ থেকে সেই তৎপরতায় বাধা দেয়া হয়েছে। ঢাকার রাস্তায় ত্রাণ তহবিল সংগ্রহের যে উদ্যোগ লক্ষ্য করা গিয়েছিল তা পুলিশের বাধায় বন্ধ হয়ে গেছে। বিভিন্ন সংস্থা তাদের নিজেদের উদ্যোগে যে ত্রাণ তৎপরতা শুরু করেছিল তাও থেমে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।

আসলে বন্যা যে সারা দেশে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চলেছে জোট সরকার প্রথমে এটাই উপলব্ধিতে নেয়নি। বরং প্রথম থেকেই বন্যা পরিস্থিতিকে তারা অস্বীকার করতে চেয়েছে। এবারের বন্যা প্রথমে আঘাত হানে সিলেটসহ হাওর অঞ্চলসমূহে। সেই বন্যা বিভিন্ন উপজেলায় ছড়িয়ে পড়ে খোদ সিলেট মহানগরকে প্লাবিত করলেও জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান এক ধরনের নির্লিপ্ত মনোভাব গ্রহণ করেন। অন্যদিকে ত্রাণ উপমন্ত্রী সিলেটের বন্যা নিয়ে মন্তব্য করেন যে সাংবাদিকরা পুরনো ছবি ছাপিয়ে বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর খবর দিচ্ছে। ত্রাণ উপমন্ত্রী আরও বলেন, দেশে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য ও ত্রাণসামগ্রী আছে। সুতরাং সে ব্যাপারে ভাবনার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু বন্যা পরিস্থিতি ক্রমেই বেড়ে সারা দেশে ছাড়িয়ে পড়ার পর দেখা গেল যে, সরকারি ভান্ডারে ত্রাণ থাকলেও মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছাচ্ছে না। কেন্দ্রীয়ভাবে তো

বটেই, জেলা পর্যায়েও সরকারি কর্মকর্তারা ত্রাণ-উদ্ধারের ব্যাপারে কোনো প্রস্তুতি নেয়নি। ফলে বানভাসি মানুষের দুর্ভোগ প্রতিদিন বেড়েছে। অনেক জায়গায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়নি, আর যেসব জায়গায় খোলা হয়েছে সেখানেও ত্রাণ নিতান্তই অপ্রতুল। এই পরিস্থিতি এখনও অব্যাহত আছে। সরকারি হিসাবেই মাথাপিছু যে ত্রাণ দেয়া হচ্ছে তার পরিমাণ এক টাকা একুশ পয়সা মাত্র। বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনারত দাতা সংস্থার প্রতিনিধিরা বন্যা পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে বলেছেন, সরকার ও বিভিন্ন সংস্থা ত্রাণ হিসেবে যে খাদ্য বিতরণ করছে তা পর্যাপ্ত নয়। প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম খাদ্য পাচ্ছে বন্যার্তরা। তবে কেবল ত্রাণ হিসেবেই নয়, পানি নামতে শুরু করলে আরো বেশি খাদ্যের প্রয়োজন দেখা দেবে। কেননা কৃষি খাত ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে দেশের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানুষের জন্য ক্ষুধার মাস হিসেবে পরিচিত আগামী অক্টোবর, নবেম্বর, ডিসেম্বর পর্যন্ত খাদ্য সহায়তার প্রয়োজন হবে।

কিন্তু এই জরুরি ত্রাণের ব্যাপারেই জোট সরকার একেবারেই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে প্রথম দিকে তারা বন্যা পরিস্থিতির ভয়াবহতাকেই স্বীকার করতে রাজি হয়নি। এখন প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন বন্যাদুর্গত অঞ্চল সফর করতে গিয়ে বলছেন, বন্যা কেবল দুঃখ নয়, সুখও বয়ে আনে। এটা কেবল অভিশাপ নয় আশীর্বাদও। কারণ বন্যায় আনা পলিমাটি ফসলের ক্ষেতকে উর্বর করে।

কিন্তু সেই উর্বর মাটিতে ফসল করা পর্যন্ত বেঁচে থাকার উপায় কি, প্রধানমন্ত্রী সে ব্যাপারে কিছু বলছেন না। বলছে না তার সরকারি কর্মকর্তারাও।

এদিকে সরকারের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাছে কোনো ত্রাণ চাইবে না। বন্যা-পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য চাইবে। এজন্য জাতিসংঘের কাছে লেখা হয়েছে। তাদের টিম বন্যার ক্ষয়ক্ষতি জরিপ করার জন্য এসে গেছে।

বন্যাত্রাণের ব্যাপারে সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গি কেউ ব্যাখ্যা করতে পারছে না। ১৯৮৮, এমনকি ১৯৯৮-এর বন্যায় বিভিন্ন দেশ এগিয়ে এসেছিল ত্রাণের ব্যাপারে। প্লেনভর্তি করে ত্রাণসামগ্রী এসেছে, ওষুধ এসেছে। অথচ এবার পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেটই পাওয়া যাচ্ছে না। অন্তত সেটা পাওয়া গেলেও লাভ হতো। কিন্তু ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন দেশের দূতাবাস সরকারি ঐ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সরকারগুলোর কাছে জরুরি ত্রাণ সাহায্যের ব্যাপারে কিছু জানাতে পারছে না বলে জানিয়েছে। সরকারের এই অ্যাটিচুডের পরও প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্তান বাংলাদেশের বন্যার্তদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়ে জরুরি ত্রাণ সাহায্য করতে চেয়েছে। উভয় দেশের রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ এ দেশের রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেন। কিন্তু উত্তর একটাই, ত্রাণ- সাহায্য লাগবে না, পুনর্বাসনে সাহায্য দিন।

ত্রাণের জন্য বিশ্ব দরবারে হাত পাততে রাজি না হওয়ার পেছনে সরকারের কি দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করছে সেটা জানা নেই। এটা যদি হয় যে, ভিক্ষার জন্য হাত পাততে চাই না, তাহলে গ্রহণযোগ্য হতো। কিন্তু পুনর্বাসনের বিশাল টাকার জন্য যেখানে অঙ্ক কষা হচ্ছে সেখানে ত্রাণ-সাহায্যের ব্যাপারে অনীহা কেন। যে কথা প্রথমে বলা হয়েছে তা হলো, সরকার প্রথম থেকেই বন্যা পরিস্থিতিকে অস্বীকার করতে চেয়েছে। এখন আন্তর্জাতিক সাহায্য চেয়ে তাদের সেই প্রথম দিকের ঐ গাফিলতি ধরা পড়ে যাবে সে কারণে তারা এখন পানি নেমে যাওয়ার অপেক্ষায়। আর ঐ ত্রাণ এলে সেটা গরিব মানুষকে দিতে হবে। সেখানে দুর্নীতি ও লুটপাটের ভাগ ছাড়া কোনো ভাগ নেই। পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে বরং নির্মাণ, সংস্কার ইত্যাদি নামে যে সাহায্য আসবে তার ভাগ উপরতলায় পাওয়া যাবে।

বন্যার্তদের ব্যাপারে সরকারের এই মনোভাবেরই পরিচয় দেখা গেছে বেসরকারি পর্যায়ে সাধারণ মানুষের বন্যাত্রাণের কাজে অংশগ্রহণে বাধা দেয়ার ঘটনায়। যেখানে প্রয়োজন ছিল সাধারণ মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ততাকে উৎসাহিত করা, সেখানে সরকারের তরফ থেকে বন্যা তহবিল সংগ্রহের ব্যাপারেই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি কেবল, কোনো কোনো জায়গায় বন্যা-ত্রাণ-উদ্ধারকাজে বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে। জোট সরকারের দলীয় মাস্তানরা বিভিন্ন জায়গায় ত্রাণ তৎপরতায় বাধা সৃষ্টি করেছে। অনেক জায়গায় হামলা পর্যন্ত হয়েছে। বন্যা উপদ্রুত অঞ্চলে বিশেষ করে শহরগুলোতে ঘাট বসিয়ে চলাচলকারী নৌকা থেকে চাঁদা তুলছে। সরকারি প্রশাসন এ ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করছে।

সর্বশেষ খবর অনুসারে বন্যার পানি কমছে। তবে আশঙ্কা রয়েছে আগস্টে আরেকটি বন্যার। তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কিন্তু এখন যে মানুষগুলো বন্যার পানিতে ভাসছে তাদের আহার, বাসস্থান, চিকিৎসা দেবার প্রয়োজন। পানি নামলে এই প্রয়োজন আরও বাড়বে। যেসব বাড়িতে পানি ঢুকে গেছে সেগুলো বাসোপযোগী করতে হবে। ডায়রিয়ার প্রকোপ ঠেকাতে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে। প্রয়োজন হবে ওষুধের। ডাক্তারি পরিচার্যার। সরকার সেজন্য প্রস্তত আছে কি? নাকি একেও বন্যার মতো নিয়তির ওপর ছেড়ে দেয়া হবে- এ প্রশ্ন এখন সবার।

বন্যা এ দেশের মানুষের জীবনের অংশ। তাকে মোকাবেলা করেই দেশের মানুষ আবার বাঁচবে। মানুষের আশা কেবল সহমর্মিতা আর সহযোগিতা। সেখানে ঘাটতি হলেই মানুষ দুঃখ পায়, ক্ষুব্ধ হয়। ত্রাণ ও উদ্ধারের ব্যাপারে জোট সরকারের সেই মানবিক বোধের অভাবই দেশের মানুষকে পীড়িত করেছে, এখনও করছে। বন্যা চলে যাবে কিন্তু মানুষের মনের কষ্ট যাবে না।

১৯৮৮ এবং ১৯৯৮-এর বন্যায় বিভিন্ন দেশ এগিয়ে এসেছিল ত্রাণের ব্যাপারে। প্লেনভর্তি করে ত্রাণসামগ্রী এসেছে, ওষুধ এসেছে। অথচ এবার পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেটই পাওয়া যাচ্ছে না। অন্তত সেটা পাওয়া গেলেও লাভ হতো